মৈত্রীশ ঘটক

দেহ মনের সুদূর পারে: বাজারের সীমা

১

সম্প্রতি কলকাতায় আলোচনাসভায় বক্তৃতা দিতে ডেকেছিলেন এক বন্ধু। বিষয়টা একটু অদ্ভুত, মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (মূলত কিডনি) বেচাকেনার পথে যে আইনি প্রতিবন্ধক, তা সরিয়ে দেওয়া উচিত কি না। এই বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিক কালে বিদেশে জোর বিতর্ক চলছে। আইন, দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে অনেক লেখালেখি করছেন। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল বিষয়টি অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করার।

ঘটনাচক্রে ঠিক তার আগের দিন গিয়েছিলাম সিঙ্গুরে, জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাবিত সমীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার জন্যে। সেইখানে কিছু কৃষক বললেন তারা কোনো মূল্যেই জমি বিক্রি করতে রাজি নন। আবার তাঁদের থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে ধনী চাষিরা বললেন চাষে তেমন লাভ নেই, তাই ঠিক দাম পেলে জমি বিক্রি করতে রাজি। তাঁরা এও মনে করেন যে আর্থিক বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের দিক থেকে দেখলে শিল্পই ভবিষ্যৎ।

আমার পল্লবগ্রাহিতার প্রবণতা বাদ দিলে জমি অধিগ্রহণ আর কিডনি বিক্রয়ের আইনিকরণ বিষয় দুটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই মনে হবে। কিন্তু কেনাবেচার আইনি এবং নৈতিক সীমানা নিয়ে ভাবতে গেলে দেখা যাবে যে যোগাযোগ একটা আছে। নিচের সারণিতে কতগুলো লেনদেনকে ভাগ করেছি বিক্রেতা ইচ্ছুক কিনা এবং সেটি বৈধ কিনা এই দুই শ্রেণিতে:

	বৈধ	অবৈধ
বিক্রেতা ইচ্ছুক	অধিকাংশ লেনদেন	কিডনি বিক্রি
বিক্রেতা অনিচ্ছুক	সরকারি জমি অধিগ্রহণ	ডাকাতি বা জালিয়াতি

সারণি ১

দৈনন্দিন জীবনে অধিকাংশ বেচাকেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুজনেই ইচ্ছুক। কর আরোপ করা এবং স্বাস্থ্য বা গুণমান সম্পর্কিত নিয়মকানুন মেনে চলা হচ্ছে কিনা দেখা এবং তা না হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। এই একই মুদ্রার উল্টোপিঠ হল যেখানে ক্রেতা অথবা বিক্রেতার মধ্যে একজন অনিচ্ছুক সেখানে একে অন্যের ওপর জোর খাটালে বা অন্যায় কোনো পন্থা অবলম্বন করলে, তা স্বাভাবিক ভাবেই অবৈধ বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু কিডনি বিক্রির ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুজনেই ইচ্ছুক হলেও, এই বিনিময় আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কৃষিজমির ক্ষেত্রে কোনো চাষি বিক্রি করতে অনিচ্ছুক হলেও আইনি পথে সরকার সেই জমি অধিগ্রহণ করতে পারে।

২

অর্থনীতিতে যে-কোনো প্রস্তাবের মূল্যায়ন করা হয় সাধারণত তিন দিক থেকে: দক্ষতা (efficiency), সাম্য (equity) এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা (individual freedom)। এদের সম্পর্ক এবং সংঘাত নিয়ে কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে অনেক মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। বেশি জটিলতায় না গিয়ে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে মোদ্দা কথা যদি বলতে হয়, তা হল, কোনো কিছুর মূল্য (সে এক গেলাস জল হোক বা কৃষিজমি) যদি ক্রেতার কাছে বিক্রেতার থেকে বেশি হয় তাহলে সেই লেনদেনে অর্থনৈতিক দক্ষতা বাড়ে। কিন্তু কোনো লেনদেনে বিক্রেতার বিক্রি করার কারণ যদি হয় দারিদ্র্য এবং অভাব (যেমন গরিব চাষির জমি বা কিডনি বিক্রি করে দেওয়া) তাহলে দক্ষতা বাড়লেও সাম্যের দিক থেকে দেখলে এই লেনদেন আপত্তিকর। আবার যে জিনিসের ওপর আমাদের মালিকানা আছে (যেমন, আমাদের শ্রমশক্তি বা জমি) তা বিক্রি করা বা না করার অধিকারে অহেতুক হস্তক্ষেপ কাম্য নয়, এ হল এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা-নীতির বিধান। এখন অধিকাংশ বাজারি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রথম এবং তৃতীয় নীতিটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এর ব্যতিক্রম হল অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে সম্পর্ক-বহির্ভূত প্রভাব (externality) তার উপস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ, রাম আর শ্যামের লেনদেনে যদি যদু বা মধুর ওপর কোনো কুপ্রভাব পড়ে তা হলে রাম আর শ্যামের লেনদেনের অধিকার অবাধ হতে পারে না। জনবসতির মধ্যে দূষণ উৎপাদনকারী কারখানা তৈরি করা হল একটি প্রচলিত উদাহরণ। নীচের সারণিতে এই তিনটি দিক থেকে কতগুলো লেনদেনকে বিচার করা হয়েছে :

	দরিদ্র চাষির জমি অধিগ্রহণ	দরিদ্র চাষির জমি বিক্রি	ধনী চাষির জমি বিক্রি	কিডনি বিক্রি
দক্ষতা	✗	✔	✔	✔
সাম্য	✗	✗	?	✗
ব্যক্তিস্বাধীনতা	✗	✔	✔	✔

সারণি ২

এখানে স্বেচ্ছাকৃত লেনদেনগুলির সবকটি ক্ষেত্রেই দক্ষতা বাড়বে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রথম উদাহরণটির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত লেনদেন হচ্ছে না। সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে কেবল একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর এমন একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা তার পক্ষে ক্ষতিকর। এখন ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন ধনী চাষির জমি দরিদ্র চাষিকে দেওয়া হয়ে থাকে সাম্যের দিক থেকে দেখলে যা কাম্য, দরিদ্র চাষির জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপক যেহেতু ধনী শিল্পপতি, তা সাম্যের দিক থেকে কাম্য নয়। এই উদাহরণটির ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্নটি আরো একটু জটিল। উৎপাদনশীলতার দিক থেকে দেখলে হয়তো আপাতদৃষ্টিতে দক্ষতা বাড়তে পারে কিন্তু প্রশ্ন হল সেই বৃদ্ধি যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে জমির মালিককে সন্তুষ্ট করার মতো দাম দিয়েও লাভ থাকার কথা। আর তাই যদি হয় তাহলে সরকারি হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন থাকার কথা নয়। কেউ ভাবতে পারেন শিল্পপতির লাভ চাষির ক্ষতির থেকে বেশি না হলেও যদি বৃহত্তর সমাজের লাভ যথেষ্ট হয় (যেমন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে) তাহলে অধিগ্রহণ সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও ওই একই যুক্তি খাটে। মোট লাভ যদি কৃষকের ক্ষতির থেকে বেশি হয়, তা হলে জোর খাটানোর দরকার কী? তাই শিল্পস্থাপন করার জন্য দরিদ্র চাষির জমি অধিগ্রহণের কোনো রকম যৌক্তিকতা নেই। মুক্ত বাজারপন্থীরা সাধারণত অর্থনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর জোর দেন, আর বামপন্থীরা দেন সাম্যের ওপর। এটি একটি বিরল উদাহরণ যেখানে তাদের একমত হবার কথা।

অন্য উদাহরণগুলির দক্ষতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার দিক থেকে দেখলে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সাম্যের দিক থেকে দেখলে দারিদ্র্যের তাড়নায় জমি বা কিডনি বেচা মেনে নেওয়া মুশকিল। আবার একজন ধনী চাষি তাঁর জমি বিক্রি করে দিলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তেও পারে কমতেও পারে (যাকে বিক্রি করা হয়েছে তিনি ধনী কিনা তার ওপর নির্ভর করছে)। কিন্তু সাম্যের দিক থেকে এই ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ তেমন কিছু বলার নেই। আবার অভাবের তাড়নায় দরিদ্র কৃষকের জমি বিক্রয়

যেমন সাম্যের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, তবু এরকম ঘটনায় আমরা এতটাই অভ্যস্ত, যে কিডনি বিক্রি করার মতো কথা শুনে আমাদের অতটা ধাক্কা লাগে না। ঘটনা হল এই যে আমাদের চারপাশে অসাম্যের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে অজস্র। কিছু বাজারি লেনদেনে সেই অসাম্য এমনভাবে ফুটে ওঠে যা আমাদের আলোড়িত করে কিন্তু এমন নয় যে সেই বাজারটি না থাকলে অসাম্য দূর হয়ে যেত। তাই বাজারের সীমা নিয়ে ভাবতে গেলে শুধু সাম্যের মাপকাঠি দিয়ে বেশি দূর এগনো যাবে না।

আগেই বলেছি, কোনো লেনদেনের প্রভাব যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ওপর পড়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেচাকেনার অধিকার অবাধ হতে পারে না। সম্প্রতি দূষণ রোধের জন্যে কলকাতায় আদালতের হুকুম অনুসারে কিছু ধরনের যানবাহনের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তা তাদের মালিক, চালক বা যাত্রীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হলেও এতে আপত্তি করা মুশকিল কারণ আরও অনেকে এই দূষণ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু কিডনি বিক্রির ক্ষেত্রে এরকম কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক-বহির্ভূত প্রভাব নেই। এখানে বলে রাখা ভালো যে অন্য দুজনের মধ্যে যে-কোনো লেনদেনেরই আমাদের ওপর পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে। যেমন দেহব্যবসা বা জুয়াখেলা নিয়ে আমাদের নান্দনিক বা নৈতিক আপত্তি থাকতেও পারে এবং যে-কোনো জায়গায় এগুলি করা যাবে না তা নিয়ে নিয়মকানুনও থাকতেই পারে। কিন্তু তাই বলে আইন করে এগুলি বন্ধ করার পথে প্রধান অন্তরায় হল এই মাপকাঠিগুলো নৈর্ব্যক্তিক নয়।[১]

বাজারের সীমা নির্ধারণ করার জন্য আর যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে একটি হল ক্রেতা বা বিক্রেতার বিচারবুদ্ধি এবং জ্ঞান সীমিত হলে তারা এমন কিছু করে বসতে পারে যাতে তাদেরই আখেরে ক্ষতি হবে।[২] এখন অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ সব দেশেই আছে এবং তার পেছনে যুক্তি বেশ জোরদার। কথা হল, প্রাপ্তবয়স্কদেরও যেহেতু অনেক আচরণে আখেরে তাঁদের নিজেদেরই ক্ষতি হতে পারে (যেমন নেশা করা, জুয়া খেলা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ধার নেওয়া, বা এমন কোনো জীবিকা নেওয়া যাতে স্বাস্থ্য এমনকি প্রাণ সংশয় হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কী করণীয়?) অর্থনীতির জগতে সম্প্রতি আলোড়ন তুলেছে আচরণবাদী অর্থনীতি (behavioural economics)। এর মূল বক্তব্য হল অধিকাংশ মানুষেরই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার প্রবণতা আছে, যদিও ধ্রুপদী অর্থনীতিতে ধরে নেওয়া হয় নিজেদের ভালো লোকে নিজেরাই সবচেয়ে ভালো বোঝে। এখন আমাদের মতো দেশে যেখানে দারিদ্র্য এবং অশিক্ষায় ডুবে আছে সমাজের একটা বড় অংশ, সেখানে এই যুক্তিটি অগ্রাহ্য করার কোনো

উপায় নেই। কিন্তু এর বিরুদ্ধে যুক্তি হল তাই জন্যে তো তাহলে অনেক লেনদেনই বন্ধ করে দিতে হয়। তাছাড়া, এইসব ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরার আগে বাধ্যতামূলক ভাবে কিছু সময় অপেক্ষা করার জন্য নিয়ম করা যেতে পারে। তাছাড়া এই ধরনের সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য কুফল নিয়ে প্রচার করা যেতে পারে। এমনকি সরকারি বা বেসরকারি নিরপেক্ষ কোনো সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্যে। এখন দীর্ঘমেয়াদী ধার নেওয়া, বিপজ্জনক কোনো পেশায় যোগ দেওয়া (যেমন সেনাবাহিনী), বা কষ্টার্জিত সঞ্চয় এমন জায়গায় বিনিয়োগ করা যেখানে ঝুঁকি প্রচুর এই সব ক্ষেত্রে এই যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু অভাবের দায়ে একজন গরিব মানুষ যদি তাঁর শরীরের অঙ্গ বিক্রি করেন সেই ক্ষেত্রে এই পন্থাগুলি যথেষ্ট কিনা তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ এবং অস্বস্তি থেকে যায়।

৩

ফিরে আসা যাক কিডনি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসঙ্গে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ইরান বাদ দিলে প্রায় সমস্ত দেশেই কিডনি বেচাকেনা বেআইনি (ভারতে ১৯৯৪ সালে এই আইন পাশ করা হয়)। যদিও স্বেচ্ছায় কোনো আত্মীয় তাঁর কিডনি দান করতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেখলে এই অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি খুব বেশি নয় এবং মানুষের শরীরে একটি সক্ষম কিডনিই যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনা বাদ দিলে, নষ্ট হলে দুটি কিডনিই একসাথে নষ্ট হয়, তাই একটি বাড়তি কিডনি থাকার মূল্য খুব বেশি নয়। আর শুধু তাই নয়, কিডনি দান করা যদি আইনি হয় তা হলে বিক্রি করা কেন হবে না অন্তত স্বাস্থ্যের ঝুঁকির দিক থেকে তা পরিষ্কার নয়। কিডনি বিক্রি আইনি করার সমর্থক যারা, তাঁদের মতে, হিসেবটা খুব সোজা। দুজন মানুষ যদি একটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকেন, একজন মানুষ দুটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকার থেকে তো তা ভালো। সমস্যা হল, ভারত (১৯৯৪ সালের আইন পাশের আগে) এবং ইরানে (১৯৮৮ সালে কিডনি বিক্রি বৈধ ঘোষণা হবার পরে) বিক্রয়কারীদের একটা বড় অংশ একটি সমীক্ষায় বলেন যে তাঁদের স্বাস্থ্যজনিত নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং প্রায় ৮০% জানান যে আবার ভেবে দেখার সুযোগ পেলে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিতেন না।[৫] এমন হতে পারে সম্পন্ন দেশে অস্ত্রোপচার এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামো অনেক উন্নত বলে এই ধরনের সমস্যা হবার সম্ভাবনা কম। তাই আলোচনার খাতিরে ধরে নেওয়া যাক অন্তত স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই পদ্ধতির ঝুঁকি খুব বেশি নয়। এই পরিবেশে কি কিডনি কেনাবেচা বৈধ করা উচিত?

এর উত্তর খুঁজতে অন্য একটি উদাহরণের কথা ভাবা যাক: হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা (heart transplant)। এটি প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব কিন্তু এই ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডটি আসে সদ্য মৃত কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যিনি স্বেচ্ছায় তাঁর হৃৎপিণ্ড মরণোত্তর দান করে গেছেন। ভাবা যাক এই ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড বেচাকেনা আইনি করা উচিত কিনা। আবার আলোচনার খাতিরে ভাবা যাক এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে জোর জবরদস্তি বা অসাধু কোনো উপায় ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এখন মৃত্যুপথযাত্রী কেউ যদি অর্থের বিনিময়ে তাঁর হৃৎপিণ্ড মরণোত্তর দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি করেন সেটা একটা সম্ভাবনা। কিন্তু আরো মারাত্মক সম্ভাবনা হল যদি স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ অর্থের বিনিময়ে তাঁর পরিবারের কথা ভেবে অভাবের তাড়নায় তাঁকে হত্যা করার পর হৃৎপিণ্ড নিয়ে নেবার সম্মতি দেন। পৃথিবীর কোনো দেশের আইন এটা মেনে নিতে পারে না এবং খুব সঙ্গত কারণেই পারে না। আবার উল্টো দিকে মাথার চুল, রক্ত, শুক্রাণু কিংবা ডিম্বাণু বিক্রি অধিকাংশ দেশেই আইনি। এখন আমাদের শরীর এই পদার্থগুলিকে আবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নতুন করে তৈরি করে নিতে পারে। কিডনি বা হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে তা নয়, যদিও কিডনির ক্ষেত্রে অবশিষ্ট কিডনি দুটি কিডনির কাজ চালিয়ে নিতে পারে। তাহলে এই ধরনের অস্ত্রোপচারে শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা এবং সেই ক্ষতির পরিমাণ কতটা তা আইনিকরণ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়ার পেছনে কাজ করছে। উগ্র বাজারপন্থীরাও মেনে নেবেন যে মাথার চুল এবং হৃৎপিণ্ডের মাঝামাঝি কোথাও কেনাবেচার অধিকারের একটা সীমারেখা টানার প্রয়োজন। যে দেশে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মান, অন্তত দরিদ্রশ্রেণির মানুষের কাছে উঁচু নয় সেখানে এই সীমারেখাটি টানার ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন। তাই আমার মতে ভারতের মতো দেশে কিডনি বিক্রির পথে আইনি প্রতিবন্ধক রাতারাতি সরানো উচিত নয়, বিশেষত যেখানে আমেরিকা বা ইউরোপের মতো দেশেও (যেখানে বৈধকরণের পক্ষে যুক্তি আরো অনেক জোরদার) এটি বেআইনি। ভারতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ কিডনির দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং যাঁরা কিডনি প্রতিস্থাপনে উপকৃত হবেন। সদ্যোমৃত মানুষের থেকে কিডনি সংগ্রহ করার পথ সুগম করা একটি সম্ভাব্য বিকল্প (যেখানে পথ দুর্ঘটনায় প্রতিবছর প্রায় সমানসংখ্যক মানুষ মারা যান)। কাজটা সোজা নয় কারণ এর বাস্তব অসুবিধা আছে (ঠিকঠিক না মিললে কিডনি কাজে লাগে না, আবার তা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য মজুত করেও রাখা যায় না) আর আছে মৃতের শরীর কাটাছেঁড়া করা নিয়ে সংস্কার।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে-কোনো কিছু বেআইনি হওয়া মানে এমন নয় যে তা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের দেশে কিডনির কালোবাজার আছে শুধু তাই

যে-কোনো কালোবাজারের মতোই এর ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় নানা শ্রেণির দালালেরা। এর ফলে বিক্রেতারা যা দাম পান তা ক্রেতাদের দেওয়া দামের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। আবার ক্রেতারাও অনেক সময় ঠকে যান। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলার এবং অসাধু চিকিৎসকের লোভের পরিণাম এই ক্ষেত্রে যে কীরকম মারাত্মক হতে পারে তা কল্পনা করে নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়। খবরের কাগজে এই বিষয়ে নানা কেলেংকারির কথা প্রায়ই চোখে পড়ে। অনেকে মনে করেন এই ক্ষেত্রে আইনি বাধা দূর করলে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনলে হয়তো মন্দের ভালো হবে। ইরান (যাকে মুক্ত বাজার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে ভাবার এমনিতে কোনো কারণ নেই) এই কারণেই ১৯৮৮ সালে এই নীতি অবলম্বন করে। তার ফলস্বরূপ ইরানই হল একমাত্র দেশ যেখানে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য যে চাহিদা তা মেটানোর মতো যথেষ্ট জোগান আছে।[৪]

এখানে বলে রাখা ভালো যে ইরানে সরকার এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহযোগে এই লেনদেনটি অনুষ্ঠিত হয়, খোলাবাজারের মাধ্যমে নয়। আগেই বলেছি এ দেশেও কিডনি বিক্রেতাদের একটা বড় অংশ স্বাস্থ্যজনিত নানা সমস্যার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে আবার সুযোগ পেলে এই সিদ্ধান্ত তারা নিতেন না। তাই চাহিদা আর জোগানের সমতা সাধারণ কোনো বাজারের ক্ষেত্রে কাম্য হলেও, এই ক্ষেত্রে সেই যুক্তি ঠিক খাটে না। আরও বড় কথা হল, কালোবাজারের যেমন নানা সমস্যা আছে, তেমন আবার আইনের ভয় এবং দালালদের লোভের কারণে জোগান তুলনামূলকভাবে কম। আইনি বাধা তুলে নিলে যেমন বিক্রেতারা ভালো দাম পাবেন এবং কিছু কিছু অনাচার কমবে, সেই একই কারণে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে জোগান বাড়বে অনেক। পূর্বালোচিত নানা কারণে তা কাম্য নয় বলেই আমি মনে করি। তবে একথা ঠিক যে আইনি পথেও অন্যান্য নানা নিয়ন্ত্রিত (regulated) পণ্যের মতো (যেমন, সিগারেট বা মদ) অন্য উপায়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, যেমন সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে বাধ্যতামূলক সতর্কতা, প্রচার, এবং কর আরোপ করা।

সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বাজারের সীমারেখা নির্ধারণ করে যে নীতিগুলি, উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। প্রথমত, এমন কোনো লেনদেন যেখানে একপক্ষের প্রত্যক্ষভাবে লাভ হয় কিন্তু অন্যপক্ষের গুরুতর ও অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। একপক্ষের লাভের কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন কারণ তা না হলে বিপজ্জনক অনেক কাজকেই বেআইনি ঘোষণা করতে হয় (যেমন কিছু ধরনের খেলাধুলো)। দ্বিতীয়ত, যেখানে দুই পক্ষের লেনদেনের প্রভাব তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ওপর পড়তে পারে। তৃতীয়ত, যেখানে প্রশ্ন উঠতে

পারে দীর্ঘমেয়াদী এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেবার মানসিক প্রস্তুতি সিদ্ধান্তকারীর আছে কিনা। আগেই বলেছি পণ্যের গুণমানজনিত নিয়মকানুনের প্রয়োগ যেখানে শিথিল সেইখানে এই প্রত্যেকটি যুক্তির ওজন বাড়ে, আর তাই বাজারের সীমারেখা টানতে হবে যেখানে এই সমস্যাগুলি কম তার থেকে আগে।

উপরোক্ত নীতিগুলির (বিশেষত প্রথম এবং তৃতীয়টির) সাথে দারিদ্র্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যেমন অভাবের তাড়নায় নিজের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনো কাজ করার সম্ভাবনা দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রেই বেশি। সেই রকম শিক্ষার অভাবে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নেবার জন্য যে ধরনের ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হয় তাঁদের ক্ষেত্রে আশা করা যায় না। কিন্তু তাই বলে আলাদা করে দারিদ্র্য ও অসাম্যের কারণে কোনো লেনদেন বন্ধ করে দেবার পক্ষে বিশেষ কোনো যুক্তি নেই। তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। দারিদ্র্য এবং অসাম্য দূর করার একমাত্র উপায় পুনর্বণ্টন। এই কঠোর সত্য এড়াবার কোনো পথ নেই। পুনর্বণ্টনের ধরন অনেক রকম হতে পারে, যেমন ভূমিসংস্কার থেকে শুরু করে সরকারি রাজস্ব দারিদ্র্য দূরীকরণের নানা প্রকল্পে ব্যয় করা (কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিস্তার)। অথচ কিডনি বিক্রির আইনিকরণের বিরোধীরা সচরাচর দারিদ্র্যের যুক্তিটির ওপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেন।

৪

বাজারের সীমারেখা নিয়ে ভাবতে গেলে দাম (price) এবং মূল্যের (value) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। সব কিছুর কি অর্থে মূল্য হয়? মানব-সম্পর্ক, মূল্যবোধ, নিজের দেশ, সংস্কৃতি, ভিটেমাটির প্রতি টানের বাজার দর হয় কি? টাকার জন্য যা খুশি করতে পারা নৈতিক দিক থেকে খুবই নিচু চোখে দেখা হয়। কেউ কেউ পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু (সৌভাগ্যক্রমে) অনেকে আবার পারেন না। এখন প্রশ্ন হল যাঁরা পারেন না তাঁরা কি কোনো মূল্যেই পারেন না? আবার এও ঠিক টাকা বাদ দিলে যে-কোনো একটি মূল্যবোধের স্বার্থে অন্য কোনো মূল্যবোধ বিসর্জন দিলে একমত না হলেও আমরা অনেক বেশি সহানুভূতির চোখে ব্যাপারটা দেখি (যেমন অনাহারক্লিষ্ট সন্তানের মুখ চেয়ে যদি কোনো পিতা মরিয়া হয়ে কোনো অসৎ কাজ করে বসেন)। এর অর্থ হল আমরা কোনো কাজের শুধু পরিণাম (consequence) দেখি না। কী পদ্ধতি (procedure) অবলম্বন করা হয়েছে এবং কী উদ্দেশ্যে (intention) করা হয়েছে তাও দেখি। অথচ অর্থনীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো কিছুর মূল্যায়ন করতে শুধু পরিণামের ওপর জোর দেওয়া হয়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে দান অথবা বিক্রির মূল তফাতটা এইখানে। দুক্ষেত্রেই মূল লেনদেনটি এক, এবং তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং পরিণামও এক। তফাত হল এক ক্ষেত্রে এটি একটি বাজারি লেনদেন আর অন্য ক্ষেত্রে এটি করা হচ্ছে স্বেচ্ছায়, কোনো আর্থিক বা জাগতিক হিসেব-নিকেশ না করে। কিন্তু অর্থনীতির চোখে এই দুটি লেনদেনকে একইভাবে দেখা হবে, তফাত এই যে বিনিময় দুটি হচ্ছে দুটি দামে। একক্ষেত্রে দামটি শূন্য আর অন্যক্ষেত্রে দামটি ধনাত্মক। খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনেক অর্থনীতিবিদ এর থেকে সিদ্ধান্ত নেন যে আইন করে দাম যদি শূন্যে বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে তো বাজারি যুক্তিতে অনেক অসুবিধা হবারই কথা, যেমন চাহিদা এবং জোগানের অসাম্য।

জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গেও এই বিষয়টি একইভাবে উঠে আসে। সিঙ্গুরের জমি বিক্রিতে অনিচ্ছুক কৃষককে যখন প্রশ্ন করা হল যে এমন নিশ্চয়ই কোনো দাম আছে যাতে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন, খুব শান্ত ভাবে তিনি বললেন, না, টাকা দিয়ে আমি কী করব, চাষবাসই আমার জীবন। তাত্ত্বিকভাবে জানি শিল্প প্রয়োজন এবং ইতিহাসের অমোঘ গতিতে এঁর সন্তানই হয়তো এই জমি বেচে দেবেন। অথচ এঁর ক্ষেত্রে মূল্য এবং দামের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পারে এমন কোনো বিনিময় হার নেই। মনে হল আমায় যদি কেউ বলেন, কত অর্থ পেলে তুমি সারাজীবন আর লেখাপড়া করতে পারবে না এমন প্রতিশ্রুতি দেবে, আমার উত্তরও ঐ কৃষকের মতোই হবে। আবার এও সত্যি প্রিয়জনের চিকিৎসার জন্যে অর্থসংকট হলে এই কৃষকই হয়তো তাঁর এত প্রিয় জমি বিক্রি করে দেবেন। আর আপাতদৃষ্টিতে পরিণামের দিক থেকে দেখলে এই লেনদেনটি ব্যবসায়িক মনে হলেও, উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখলে তা নয়।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা যদি মনে করি একজন ভেবেচিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং মেনে নিই যে তিনি কী উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা অন্য কারুর পক্ষে জানা মুশকিল, তা হলে কী যুক্তিতে আমরা দান আইনসম্মত কিন্তু বিক্রি নয় বলতে পারি? একজন পিতা যদি তাঁর সন্তানকে কিডনি দান করেন তা বৈধ। তাঁর কিডনি যদি তাঁর সন্তানের অন্য কোনো পিতা-সন্তানের (বা স্বামী-স্ত্রী) সাথে কিডনি বিনিময় করেন তাও বৈধ। কিন্তু তিনি যদি তাঁর কিডনি বিক্রি করেন সন্তানের অন্য কোনো কঠিন ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে তা বৈধ নয়। এখানে যে একটা সমস্যা আছে, তা পরিষ্কার।

এর আগে আমি কিডনি বিক্রির বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিয়েছি তা অর্থনীতির পরিণামপন্থী (consequentialist) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কোনো লেনদেনে যদি একপক্ষের লাভ কিন্তু অন্য পক্ষের জীবন সংশয় বা স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই ঝুঁকি নিয়ে বিক্রেতা সম্পূর্ণভাবেই অবহিত না হবার

সম্ভাবনা থাকে (তা তাঁর অজ্ঞানতা বা নিয়মকানুনের শিথিল প্রয়োগের জন্যই হোক) তা হলে সেইখানে আইনি সীমারেখা টানার প্রয়োজন। কিন্তু দান এবং কেনাবেচার ক্ষেত্রে আইন আলাদা হতে পারে কেন তা বোঝা দরকার। দানের ক্ষেত্রে "ক্রেতা" এবং "বিক্রেতা" যেহেতু অর্থের বিনিময় করছে না, তাই এখানে গুণমানজনিত সমস্যা এবং অসাধু ব্যবসায়িক আচারের সম্ভাবনা কম। স্বাস্থ্যজনিত ঝুঁকি একই রকম, কিন্তু ব্যবসায়ী বা দালালের লোভের জন্য এই ঝুঁকি অনেকগুণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা অনুপস্থিত। তাই পরিণামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখেও আইনিকরণের বিপক্ষে যুক্তিটি জোরদারই থেকে যায়।

কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের মূল্য সমাজকে দিতে হয়। তার প্রধান কারণ হল দাতা এবং গ্রহীতার শরীরের প্রাসঙ্গিক অঙ্গটি চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে সংগতিপূর্ণ না হতে পারে। এখানে বিভিন্ন দাতা এবং গ্রহীতাদের মধ্যে বিনিময়ের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, কিন্তু সেই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বোঝা শক্ত নয়। যতই হোক অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময় ব্যবস্থার (barter) সীমাবদ্ধতার কারণেই অর্থব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

৫

বাজার ব্যবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভালো বা মন্দ যে-কোনো কারণেই হোক বাজার ব্যবস্থা চালু আছে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের আইনি সীমা নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করলাম। এই বিষয়ের আরো অনেক দিক আছে। স্থান, কাল এবং পাত্রের (অর্থাৎ লেখকের) সীমাবদ্ধতার কারণে তার অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেল। পরে কখনো এই নিয়ে আবার আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

টীকা

১। বলাই বাহুল্য যে যে-কোনো পণ্য বা পরিষেবার গুণমান নিয়ে সরকারি নিয়মকানুন সব দেশেই আছে এবং থাকাই বাঞ্ছনীয়। আপাতত আলোচনার খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে বাজারেরই কথা হোক না কেন সেখানে সেই পণ্যের গুণমান নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই। পরে এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা আছে।

২। এই প্রসঙ্গে রবি কানবুরের "On Obnoxions Markets" নামক প্রবন্ধটি, যা Stephen Cullenberg এবং Prasanta Pattanaik সম্পাদিত *Globalization, Culture and the Limits of the Market: Essays in Economics and Philosophy*, Oxford University Press, 2004 সালে প্রকাশিত হয়, দেখতে পারেন। এটি ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়।

৩। এই বিষয়ে Gary Becker এবং Julio Elias-এর "*Introducing Incentives in the Market for Live and Cadavevic Organ Donations*" শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। এটি অপ্রকাশিত কিন্তু ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

৪। এই বিষয়ে Benjamin Hippen-এর "Organ Sales and Moral Travails: Lessons from the Living Kidney Vendor Program in Iran" প্রবন্ধটিতে যা *Policy Analysis* পত্রিকায় ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় দ্রষ্টব্য। এটি ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই বিষয়টি নিয়ে মণীষিতা দাশ এবং টিমথি বেসলির সাথে বহু আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। এই প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেয়সী দস্তিদার, দময়ন্তী লাহিড়ী এবং লিপি ঘটক। সম্পাদক অনিল আচার্যের নিরন্তর তাড়া না থাকলে প্রবন্ধটি লেখা হয়ে উঠত না। তাতে ভালো হল না মন্দ হল নিশ্চিত নই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেব কিনা বুঝতে পারছি না। পাঠকের মতামত জানাবার ঠিকানা maitreesh@gmail.com.